দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUL. 26 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

আহমেদ হুমায়ূন
কিছু স্মৃতি এবং কিছু কথা

আহমেদ হুমায়ূন (জন্মঃ ১৮ মে, ১৯৩৬–মৃত্যুঃ ২৩ জুলাই ১৯৯৯)

সানাউল্লাহ্ নূরী

মাত্র তেষট্টি বছর বয়সে চলে গেলেন আহমেদ হুমায়ূন। আমার দশ বছরের কনিষ্ঠ তিনি। বছর তিনেক আগে যে মরণান্তিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলাম তাতে যাওয়ার কথা ছিল আমারই আগে। অথচ আগাম চলে যেতে হলো হুমায়ূনকে। মৃত্যুর শীতল বাহু কখন কার দিকে হাত বাড়ায় তা বলার সাধ্য কারও নেই। আমাদেরই তো কাছের অনেক বন্ধু চল্লিশের সিঁড়ি ভাঙতে না ভাঙতে শীতের পাতা ঝরার মতন হঠাৎ ঝরে গেলেন। সে সব কথা ভাবলে কুঁকড়ে যাই। বিক্ষত হই যন্ত্রণায়।

গেল শুক্রবার বিকাল ৪টায় হাসপাতালের রোগশয্যায় অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন হুমায়ূন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। দু'বছর ধরেই বিপর্যয় ছেঁকে ধরেছিল এই উজ্জ্বল সাংবাদিক-সাহিত্যিককে। হঠাৎ বিছানায় পড়া আবার ক'দিন বাদে সেরে ওঠা। কিন্তু এবার আর রোগশয্যা থেকে উঠলেন না। চিরকালের মতো বুজলেন দু'চোখ। চল্লিশ বছর ধরে যাঁর সঙ্গে ওঠা-বসা, সংবাদপত্রের টেবিলে একই কক্ষে টানা পনেরো বছর কলমের ঘানি টানা এমন একজনের আচমকা মৃত্যু সংবাদ শুনলে কেমন হয় নের অনুভূতি তা ভাষায় ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। ভিতে সংবাদটি শোনার পর আর স্থির থাকতে রিনি। ভাবছিলাম কখন দেখতে পাব তাঁর ঘুমন্ত খানি। বাসাবো থেকে অনেক দূরের পথ উত্তরা বাসিক এলাকা, বিশেষ করে আমার মতো একজন ুস্থ লোকের পক্ষে। কিন্তু তারপরও বসে থাকতে রলাম না। টেলিফোন করলাম এক কাগজের ফসে। ওঁরা বললেন, জাতীয় প্রেসক্লাবে বেলা ারোটার দিকে জানাজা হবে ওঁর। পথ সংক্ষিপ্ত বার জন্য গেলাম সেখানে। যেতেই শুনলাম– াজা হবে উত্তরার লেকের পাড়ের মসজিদে। আর ঃ কবর দেয়া হবে উত্তরা গোরস্থানে।

াম এবার সেদিকে। গিয়ে দেখলাম, আমাদের াদিক জীবনের অন্তরঙ্গ বন্ধু কেজি মুস্তফা এবং ক দৈনিক বাংলার নির্মল সেন, সৈয়দ আবদুল ার, ফজলুল করিমসহ অনেক প্রিয়মুখ দাঁড়িয়ে ন মসজিদের সামনের রাস্তায়। সবারই মুখ , থমথমে। অনেক দিন পর এঁদের সঙ্গে দেখা। সংবাদ নেয়ার মতো মনের অবস্থা কারোরই া। বেশিরভাগকেই এঁদের তরুণ দেখেছিলাম ঃ দৈনিক বাংলা অফিসে। কেউ কাজ করতেন ডেস্কে, কেউ রিপোর্টিংয়ে। দেখলাম সবারই াক ধরেছে। বার্ধক্য এসে ঘণ্টাধ্বনি তুলছে শেষ ।

দর মেহরাবের কাছে তখন কফিনে ঢাকা ন হুমায়ূনের মরদেহ জানাজার পর দাফন হবে ষবারের মতো মুখখানি দেখবার জন্য ব্যাকুল াম। ভিড়ের জন্য কাছ ঘেঁষতে পারলাম না। া, কবর দেয়ার সময় দেখতে পাবেন। শেষে গোরস্থানে গেলাম। কফিন কবরে সময় বললাম ঃ একবার মুখের দিকের খুলুন। ওঁকে দেখে নিই। কয়েক সেকেন্ডের ন খোলা মুখমণ্ডলটির ওপর চোখ বুলিয়ে ষাট পেরুবার পর যেমনটি দেখেছিলাম প্রায় ই ছিলেন হুমায়ূন। শুধু রোগের যন্ত্রণার ছায়া র বিষণ্ণতা লেপ্টে ছিল অহোরাত্র সংবাদপত্র াজে বিভোর হয়ে থাকা এক কলমযোদ্ধার । হুমায়ূনকে শায়িত করা হলো অন্তিম ারপাশের তরুবীথির ফাঁক গলিয়ে শেষ র্যের এক ঝলক রশ্মি লুটিয়ে পড়ছিল র রাখা পুষ্পস্তবকগুলোর ওপর। মাটিতে মতো ঢাকা পড়ল আমাদের দীর্ঘকালের ীর নশ্বর দেহ।

ীবনের ধরাছোঁয়া, পেশাগত জীবনের তা, হিংসা-বিদ্বেষ, ফেডারেল সাংবাদিক -দু'বার সভাপতি পদে বিজয়ী হওয়ার সময়কালীন নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার উত্তাপ, সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সময়কার বিরূপতা, পরেকার দুঃখভোগ এবং গুণগ্রাহীদের শ্রদ্ধা-ভালবাসা ইত্যাদি সব কিছুরই উর্ধে চলে গেলেন হুমায়ূন। শেক্সপিয়ারের ভাষায় ঃ 'ডেথ্ ইজ্ দ্য লেবেলার।' মৃত্যু সব কিছুকে সমান করে দেয়। আর সে সঙ্গে ঘুচিয়ে দেয় সমস্ত ব্যবধান। রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিসহ অন্য সব অঙ্গনের মতো সাংবাদিক পেশায়ও আছে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ক্ষোভ-বিরূপতা আর ভুল বোঝাবুঝি। এটি অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু তারপরও বলব, সাংবাদিকরা তো সমাজের সবচেয়ে সচেতন অংশ। ইয়েলো জার্নালিজমের অপখ্যাত লোকেরা ছাড়া খাঁটি সাংবাদিকদের বলা হয়ঃ 'জেন্টেলম্যান অব দ্য প্রেস।' অর্থাৎ সংবাদপত্রের ভদ্রলোক। সুশীল সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধি এরা। সমাজে মানবিক এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের জাগরণে, একটি শিক্ষিত-মার্জিত-সংস্কৃতিবান শ্রেণী গড়ে তুলতে আর রাজনীতিকে সুস্থ খাতে প্রবাহিত করতে নিঃসন্দেহে এঁদের ভূমিকা অগ্রচারণের।

আমরা বাহান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্টের বিজয় অভিযাত্রায়, বাষট্টির সংবাদপত্র দলন নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পরিচালনায়, এর আগে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিরোধী আন্দোলনে প্রতিটি দৈনিক কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় অভিন্ন সম্পাদকীয় প্রকাশে, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানকালে আর একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে দেখেছি মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে সাংবাদিকদের বীরোচিত ভূমিকা পালন করতে। আইয়ুব খানের সংবাদপত্র দলনের বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দিতে দেখেছি দৈনিক আজাদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিয়ানব্বই বছর বয়স্ক মওলানা মুহম্মদ আকরম খাঁ-কে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী যুগে এই প্রবীণ সাহিত্যিক-সাংবাদিক, 'দ্য মুসলমান' পত্রিকার প্রখ্যাত সম্পাদক এবং মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সহচর মওলবী মুজীবুর রহমান, ধূমকেতু পত্রিকার সম্পাদক বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম স্বাধীনতার দাবি তুলতে গিয়ে কারাবরণ করেছেন। একাত্তরে সিরাজুদ্দীন হোসেন, শহীদুল্লাহ কায়সারসহ কত সাংবাদিকই না প্রাণ বিসর্জন দিলেন স্বাধীনতার বেদীমূলে। এই যাঁদের উত্তরাধিকার তাঁদের তো অবশ্যই একালে এবং অনাগত যুগেও সমস্ত সীমাবদ্ধতার উর্ধে উঠে জাতির দুঃসময়ে সঠিক নেতৃত্ব দিতে হবে বিবেকের আলোকবর্তিকাবাহী হিসাবে। পালন করতে হবে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা। এ কথা সত্য, প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষের মতো প্রতিটি সাংবাদিকেরই নিজস্ব সত্তা আছে। আছে মত এবং পথের পার্থক্য। অতীতেও ছিল। কিন্তু তারপরও আমাদের সময়ে তাঁরা খণ্ডিত কিংবা দ্বিধাবিভক্ত হননি। একটি দায়িত্বশীল বুদ্ধিজীবী সমাজ হিসাবে মতপার্থক্য সত্ত্বেও বিরাটতর কাজে পালন করেছেন তাঁরা অভিন্ন ভূমিকা। একজন গুণী সাংবাদিককে শ্রদ্ধা করাই তো আমাদের সবার কাছ থেকে প্রত্যাশিত।

১৯৬৪ সালের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। টিপু সুলতান রোডস্থ সাবেক দৈনিক বাংলা অফিসে নানান কাগজ থেকে আসা একদল সাংবাদিক আমরা একত্রিত হয়েছিলাম একই ছাদের তলায়। এঁদের মধ্যে ছিলেন প্রবীণ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন, কবি আহসান হাবিব। তরুণদের মধ্যে ছিলেন এখনকার প্রধান কবি শামসুর রাহমান, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের কর্মী এবং নিরাপোস লড়াকু কবি পরলোকগত হাসান হাফিজুর রহমান, আহমেদ হুমায়ূন এবং এই স্মৃতিচারক। বার্তা বিভাগে ছিলেন মরহুম মোজাম্মেল

শ্রদ্ধাঞ্জলি

হক, তোয়াব খান, নির্মল সেন প্রমুখ। ফিচার বিভাগে কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, ফজল শাহাবুদ্দিন। সব বিভাগেই ছিলেন প্রতিভাবান তরুণের দল। সেকালে এই কাগজের সাংবাদিকদের বলা হতো, 'এ গ্যালাক্সি অব ট্যালেন্টস'। অর্থাৎ এক উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জ। এঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন বাম রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। অনেকে ছিলেন এমএন রায়ের রেডিক্যাল হিউম্যানিজমের অনুরাগী। আবার কেউ কেউ ছিলেন ঐতিহ্যবাদী। মাওপন্থীও ছিলেন দু'চারজন। কিন্তু এই মতপার্থক্য আমাদের পেশাগত সম্পর্কে ছেদ রেখা টানতে পারেনি। বলতে গেলে আমরা ছিলাম একই সাংবাদিক পরিবারের সদস্য।

এখন আমরা বার্ধক্যের শেষ সিঁড়িতে। মুষ্টিমেয় যে ক'জন বেঁচে আছি, আমাদের মধ্যে অতীতের সেই নিবিড় সম্পর্ক আজও অটুট। এর প্রমাণ পেয়েছি বিদেশে চিকিৎসাধীন থাকাকালে এঁদের নিখাদ সহমর্মিতাবোধে। এই ভালবাসা কী নতুন সাংবাদিক প্রজন্মের মধ্যে কোন রকম প্রভাব ফেলবে না?

শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান এবং এই লেখকসহ যে চারজন আমরা সাবেক দৈনিক বাংলার প্রথম পর্বে সম্পাদকীয় বিভাগে ছিলাম এঁদের মধ্যে হুমায়ূন ছিলেন সবার বয়োকনিষ্ঠ। তিনি এর আগে জগন্নাথ কলেজের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের লেকচারার ছিলেন। সাংবাদিকতার হাতেখড়ি তাঁর ১৯৬২ সালে ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ঢাকা টাইমস'-এ। কাগজটি বেরুতো হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার তত্ত্বাবধানে। সংবাদ সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী এর সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন। হুমায়ূন ছিলেন কাগজটির সম্পাদকীয় লেখক। ছাত্রজীবনে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জড়িত তরুণ হুমায়ূনের ইংরেজীর তারিফ করতেন জহুর ভাই।

বাংলা এবং ইংরেজী দুই ভাষাতেই দখল হুমায়ূনের। সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক ছি আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে তাঁর ধার স্বচ্ছ। এ বিষয়ে গভীর আগ্রহ এবং সাপ্তা আর নিউজ উইকসহ আন্তর্জাতিক পত্রিকা নিয়মিত অধ্যয়নের ফলে ক্রমাগত বাড়তে রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিধি। তাঁর লেখা উ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ক নিবন্ধগুলোতে এ প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়।

আহমেদ হুমায়ূন ছিলেন একজন সৃজনশীল এবং সাংবাদিক। প্রবন্ধ ছাড়াও কবিতা এবং ছড়া রচনায়ও তাঁর হাত ছিল মিষ্টি। তাঁর বা ছিল সাবলীল এবং উচ্চাঙ্গের। অল্প পরিসরে বিষয়বস্তুর ওপর গুছিয়ে সম্পাদকীয় লেখার ছিল তাঁর একটি বিশেষ গুণ। অন্যের ভাল তারিফ করতে তিনি মোটেও কুণ্ঠিত হতেন তাঁর আরেকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল, সিনিয় প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্প রাখবার ঐকান্তিকতা। কারও সঙ্গে কখনও তা হতে দেখিনি। সরকারের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদে সাংবাদিকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনাকা কথায় যুক্তিনিষ্ঠভাবে তিনি বক্তব্য রাখতেন। এ সুবক্তা ছিলেন হুমায়ূন।

তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল সৈয়দ মহিউদ্দিন আহ হুমায়ূন। শেষের দু'টি শব্দ লেখালেখিতে ব্যবহ করতেন তিনি। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ 'বিপরীত রবীন্দ্রনাথ', 'সিঙ্গেল কলাম ডাবল কলাম', 'আ মিয়ার পৃথিবী' এবং নিয়মিত কলাম 'নগর দপ সুতীক্ষ্ণ মেধা আর মননের পাশাপাশি গণসচেতন ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। আমার বিশ্বাস, সাংবাদিকতার অষ্টপ্রহর ঘানি টানার পেশায় না একজন সাড়া জাগানো বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং কথাশি হতে পারতেন তিনি।

সাংবাদিকতা পেশার প্রতি যেন দায়বদ্ধ ছিলেন তি শুনেছি মৃত্যুর দু'দিন আগেও হাসপাতালে শুয়ে এ কাগজের জন্য নিবন্ধ লিখেছেন হুমায়ূন। এটি ছি জীবনের শেষ লেখা তাঁর।

রবীন্দ্রনাথের এই দু'টি স্তবকের কথা মনে পড়ছে ঃ 'মরিতে চাহি না আমি এই সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাহি।' আমার প্রত্যাশা, আহমেদ হুমায়ূনের নশ্বর অস্তিত্ব হারিয়ে গেলেও একজন বড়মাপের সাংবাদিক হিসাবে যেন আপন অবদান নিয়ে বেঁচে থাকেন তিনি আমাদের মধ্যে।